ভাষা আন্দোলন ও বাংলাদেশের চারুশিল্পী সমাজ

শাওন আকন্দ

DOI: https://doi.org/10.69862/carass2025LMBookShawon

বাংলাদেশের ইতিহাসে এবং পৃথিবীর ইতিহাসেও ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৪৭-এর দেশভাগের পর রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে পূর্ব-বাংলায় যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, এ অঞ্চলের মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে তার প্রভাব পড়েছিল উল্লেখযোগ্য মাত্রায়। দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রাম এবং নয় মাস সশস্ত্র যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালে পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনাবিন্দু হিসেবে ভাষা আন্দোলনকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। মূলত ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এবং বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকশিত হয়েছিল, যার চূড়ান্ত পরিণতি আমরা দেখতে পাই ১৯৭১ সালে। এ লেখায় আমরা মূলত ভাষা আন্দোলনে এদেশের চারুশিল্পী-সমাজ কীভাবে কতটুকু যুক্ত হয়েছিল এবং কী ধরনের ভূমিকা পালন করেছিল, তা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করব। একইসঙ্গে ভাষা আন্দোলনের পর বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে এদেশের চারুশিল্পীরা কীভাবে সম্পৃক্ত ছিল এবং একুশের চেতনায় বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে কীভাবে উজ্জীবিত করেছিল, তা জানার ও বোঝার চেষ্টা করা হবে এ লেখায়। তবে মূল আলোচনায় প্রবেশের আগে দেশভাগ ও ঢাকায় চারুশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত নিয়ে আমাদের কিছু আলোচনা করা দরকার।

দেশভাগ ও ঢাকায় চারুশিক্ষা প্রতিষ্ঠান

ভারতীয় উপমহাদেশে প্রায় দুইশ বছরের (১৭৫৭-১৯৪৭) ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে ১৯৪৭ সালে। এ উপমহাদেশকে দুইভাগে বিভক্ত করে ব্রিটিশরা এ দেশ থেকে বিদায় নেয় এবং জন্ম হয় ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের। পাকিস্তানের ছিল আবার দুটি অংশ: পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিম-পাকিস্তান। উল্লেখ করা যেতে পারে, এই দেশভাগ হয়েছিল দ্বিজাতিতত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে, ধর্মীয় জাতীয়তার ভিত্তিতে; এবং সমগ্র ভারতবর্ষে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় এর প্রভাব পড়েছিল।

ধর্মীয় ভিত্তিতে দেশভাগের কারণে বাঙালি অধ্যুষিত বাংলা অঞ্চল দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। যেহেতু তৎকালীন পূর্ব-বাংলা ছিল পাকিস্তানের অন্তর্গত, আর ঘোষিতভাবে পাকিস্তান ছিল মুসলমানের জন্য নির্মিত রাষ্ট্র, ফলে সেসময় পূর্ব-বাংলা থেকে হিন্দু জনগোষ্ঠীর একটা বড়ো অংশ দেশত্যাগ করে ভারতে চলে গিয়েছিল। পাশাপাশি, মুসলমান সম্প্রদায়ের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ (বাঙালি ও অবাঙালি), যারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বাস করতো, তারা পূর্ব-বাংলা বা পূর্ব-পাকিস্তানে চলে এসেছিল। দেশান্তরি এসব বাঙালি মুসলমানের ভেতর যেমন পশ্চিম-বাংলার মানুষ ছিল, তেমনি ছিল পূর্ব-বাংলার মানুষও– যারা বিভিন্ন কারণে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে বাস করতো। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরের বছর (১৯৪৮) আমরা ঢাকায় প্রথম চারুশিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি হতে দেখি এবং সেখানে এ উভয় শ্রেণির বাঙালিদেরই আমরা সক্রিয় হতে দেখি। তবে এসবের নেতৃত্বে ছিলেন পূর্ব-বাংলার জয়নুল আবেদিন (১৯১৪-১৯৭৬)। জয়নুল আবেদিন ততদিনে দুর্ভিক্ষের চিত্রমালা এঁকে খ্যাতি লাভ করেছেন। তিনি ছাড়া আরো যারা ঢাকায় চারুশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার

আন্দোলনে তাঁর সতীর্থ হয়েছিলেন, তারা হলেন আনোয়ারুল হক (১৯১৮-১৯৮০), সফিউদ্দিন আহমেদ (১৯২২-২০১২), কামরুল হাসান (১৯২১-১৯৮৮) প্রমুখ।

বলে রাখা ভালো, দেশভাগের আগে, পূর্ব-বাংলায় একমাত্র চারুশিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ছিল খুলনায়– 'মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্ট'। শিল্পী শশীভূষণ পালের নেতৃত্বে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯০৪ সালে (বর্তমানে এটি চারুকলা অনুষদ হিসেবে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত)। তবে দেশভাগের আগে ঢাকায় চারুচর্চার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো ছিল না।

যাইহোক, কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙালি মুসলমান শিল্পীরা, যারা দেশভাগের পর পূর্ব-বাংলায় চলে এসেছিলেন, তারা ঢাকায় একটা আর্ট স্কুল গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেন। এদেরই নেতৃত্ব দেন জয়নুল আবেদিন। শিল্পীরা ছাড়াও তৎকালীন কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের একটা অংশ এবং প্রশাসনের একটা অংশ এ আন্দোলনে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছিল। তারপরও, ঢাকায় চারুচর্চার অনুকূল অবকাঠামো ও পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য জয়নুল আবেদিন ও তার সহযোদ্ধাদের অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। উদাহরণ হিসেবে ১৯৪৮ সালের পোস্টার প্রদর্শনীর কথা উল্লেখ করা যায়। এই পোস্টার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল ঢাকায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে। পোস্টারগুলোর বিষয়বস্তু ছিল ভারত উপমহাদেশে মুসলিম বিজয় থেকে শুরু করে পাকিস্তান সৃষ্টি পর্যন্ত ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত ধারাবিবরণী। আমাদের দেশের দুই দিকপাল শিল্পী জয়নুল আবেদিন ও কামরুল হাসান পোস্টারগুলো আঁকার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন (ইসলাম, ২০০৩, পৃ. ৩১; আজিজুল, ২০০৪, পৃ. ১৮; হক, ১৯৯৮, পৃ. ৬০ ও ২৪৩; হক, ২০১৫, পৃ. ১৬৯)। উল্লেখ্য, এ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল মূলত তৎকালীন পাকিস্তানের আমলা ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্য করে, যারা ক্ষমতাকাঠামোর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। এ পোস্টার-প্রদর্শনীর বদৌলতে যখন পশ্চিম-পাকিস্তানের উচ্চতম মহলকে (ক্ষমতাকাঠামোর) এটা বোঝাতে শিল্পীরা সক্ষম হয়েছিলেন যে, ছবি আঁকার একটা ব্যবহারিক দিক আছে এবং যা কি না প্রয়োজনে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করা যায়, তখন ছবি আঁকার স্কুল তৈরি অনেক সহজ হয়ে গেল। প্রতিষ্ঠিত হলো গভর্মেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্ট (১৯৪৮), যা এখন 'চারুকলা অনুষদ' নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের সঙ্গে যুক্ত। সে-সময় থেকে এখনো, এ দেশের যাবতীয় চারুকলা বিষয়ক কর্মকাণ্ডের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে এ প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। যার জন্মের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ক্ষমতা-কাঠামোকে খুশি/তুষ্ট করার জন্য ইসলাম ধর্ম এবং রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানকে গৌরবোজ্জ্বল ও মহিমান্বিত করে আঁকা শতাধিক পোস্টারের একটি প্রদর্শনী।

কিন্তু বিস্ময়কর হলেও সত্যি, গোড়া থেকেই এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে– বিশেষ করে চর্চায় ও অনুশীলনে ধর্মীয় বিষয়কে কখনোই প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। নেতিবাচক বা সংকীর্ণ অর্থে যেটাকে ধর্মীয় 'সাম্প্রদায়িকতা' বলা হয়– তা এ প্রতিষ্ঠানে কখনো প্রশ্রয় পায়নি। বরং প্রতিষ্ঠানটির আদিপর্বের শিক্ষকদের অনেকে যেমন জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান প্রমুখ বাঙালি সংস্কৃতির বিভিন্ন দেশজ উপাদানের বিষয়ে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, সরকারি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও, সরকারবিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে এই শিল্প-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ও শিক্ষকেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এর কারণ কী? সেটা বুঝতে হলে আমাদের আরেকটু পেছনে তাকাতে হবে।

আন্দোলন-সংগ্রামে চারুশিল্পী সমাজঃ প্রেক্ষাপট ও পরম্পরা

১৯৪৭-এর দেশভাগের আগেই অবিভক্ত বাংলায় বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন-সংগ্রামে এ অঞ্চলের চারুশিল্পীদের অংশ নিতে দেখা যায়। উদাহরণ হিসেবে প্রাসঙ্গিকভাবে গুরুসদয় দত্তের ব্রতচারী আন্দোলনের (১৯৩২) কথা বলা যায়। এ সাংস্কৃতিক আন্দোলনে পটুয়া কামরুল হাসানসহ তৎকালীন বিভিন্ন শিল্পী যুক্ত ছিলেন। ব্রিটিশ আমলে 'খাকসার' আন্দোলনের (১৯৩১) সাথে যুক্ত ছিলেন শিল্পী এস এম সুলতান। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন অনেক শিল্পী। এর মধ্যে চিত্তপ্রসাদ (১৯১৫-১৯৭৮) ও সোমনাথ হোড়ের (১৯২১-২০০৬) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অবিভক্ত বাংলার এ দুই শিল্পীই– যারা পার্টির জন্য 'হোলটাইমার' হিসেবে কাজ করতেন– ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ নিয়ে ছবি এঁকেছেন নিজস্ব শৈলীতে। এছাড়া, কালের সাক্ষী হয়ে আছে সোমনাথ হোড়ের 'তেভাগা আন্দোলন' নিয়ে আঁকা স্কেচ আর ছাপচিত্রগুলো।

এমনকি দেশভাগের আগে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ততার বিষয়েও জানা যায়। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সরাসরি যুক্ত না হলেও ১৯৪৩ সালে তার আঁকা বিখ্যাত দুর্ভিক্ষের চিত্রমালা প্রদর্শিত হয়েছিল কলকাতায় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির আয়োজনে। এ প্রদর্শনীতে আরো অনেক শিল্পী অংশ নিয়েছিল (হক, ২০১৫, পৃ. ৩৩)। জয়নুলের দুর্ভিক্ষের স্কেচ সে-সময় বিভিন্ন পত্রপত্রিকা– বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত *জনযুদ্ধ* ও *দ্য পিপলস ওয়ার*– ছেপে প্রচার করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়াও *দ্য স্টেটসম্যান* পত্রিকাতেও জয়নুলের স্কেচ ছাপা হয়েছিল (হক, ২০১৫, পৃ. ৩৪)। ফ্যাসিবাদ-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সাথেও জয়নুল এবং কামরুল হাসান যুক্ত ছিলেন। এ সংঘকে সক্রিয় রাখার ব্যাপারে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এছাড়া ইন্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার এসোসিয়েশন (আইপিটিএ) বা গণনাট্য সংঘের সাথেও জয়নুল-কামরুলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা জানা যায়। এভাবে দেখা যাচ্ছে, সরাসরি রাজনীতির সাথে যুক্ত না হলেও বাংলাদেশের পথিকৃৎ শিল্পীরা, যারা দেশভাগের পর ঢাকায় একটি শিল্প-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন, তাঁরা কলকাতায় থাকাকালীন বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন।

পাশাপাশি, আমরা লক্ষ করি, ঢাকার এ চারুশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আদিপর্বের শিক্ষার্থীদের অনেকে বাম রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। যেমন মুর্তজা বশীর (১৯৩২-২০২০), আমিনুল ইসলাম (১৯৩১-২০১১), দেবদাস চক্রবর্তী (১৯৩৩-২০০৮), বিজন চৌধুরী (১৯৩১-২০১২) প্রমুখ। মুর্তজা বশীরের নিজের ভাষ্য থেকে আরো জানা যায়, তিনি আদতে ছবি আঁকার ব্যাপারে তেমন একটা উৎসাহী ছিলেন না। পার্টির নির্দেশে তিনি ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউটে ভর্তি হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'আর্ট পড়াটা হয়েছিল ঘটনাচক্রে। স্কুলে ছাত্রাবস্থাতে রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। পোস্টার লিখতাম, আবার পার্টি অফিসের জন্য আঁকতাম মার্কস, লেনিন কিংবা স্টালিনের প্রতিকৃতি। তাই, সেই রাজনৈতিক সংগঠনের একজন কর্মী হিসেবে আমার প্রতি নির্দেশ হলো আর্ট কলেজে ঢুকে পড়ার, ছাত্রদের মধ্যে কাজ করার' (বশীর, ২০০১, পৃ. ১১৯)। দেবদাস চক্রবর্তী ও বিজন চৌধুরী কলকাতা সরকারি আর্ট কলেজের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য সেখান থেকে বিতাড়িত হলে তাঁরা ঢাকায় চলে আসেন এবং জয়নুল আবেদিন তাঁদের ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউটে শিক্ষার্থী হিসেবে গ্রহণ করেন (ইসলাম, ২০০৩, পৃ. ৪১)। ফলে বলা যেতে পারে, বাম রাজনীতির একটা প্রভাব গোড়া থেকেই চারুকলা ইনস্টিটিউটে প্রচ্ছন্নভাবে উপস্থিত ছিল। ফলে ঢাকার সরকারি আর্ট ইনস্টিটিউটে, পাকিস্তানি শাসনামলের গোড়ার দিকেও, বাঙালি সংস্কৃতির চর্চা ও লালনের জন্য

যেমন এক ধরনের অনুকূল পরিবেশ বা প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিল, তেমনি এক ধরনের আন্দোলনের সংস্কৃতিও দানা বেঁধে উঠছিল– এরকম বলা যায়। তবে বাঙালি সংস্কৃতির জন্য ঢাকার চারুকলা ইনস্টিটিউটের এ পক্ষপাত এবং আন্দোলন-সম্পৃক্ততা প্রথম প্রকাশ্য রূপ লাভ করে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে।

ভাষা আন্দোলনে চারুশিল্পীদের অংশগ্রহণ ও তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া

স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান সৃষ্টির অল্প কিছুদিন পর থেকেই (১৯৪৮) রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে বিতর্ক ও আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ঢাকায় চারুশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যাত্রাও শুরু হয় এই বছর। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আন্দোলন তীব্র ও গতিশীল হয়ে ওঠে ১৯৫২ সালে। এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল মূলত ছাত্ররা। যদিও তখন ঢাকার সরকারি আর্ট ইনস্টিটিউট শৈশব অতিক্রম করেনি, তবু এ ইনস্টিটিউটের তৎকালীন ছাত্র-শিক্ষকরা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বিভিন্নভাবে যারা ভাষা আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন বলে জানা যায়, তাদের মধ্যে ইমদাদ হোসেন (১৯২৫-২০১১), মুর্তজা বশীর (১৯৩২-১৯২০), আমিনুল ইসলাম (১৯৩১-২০১১) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে ইমদাদ হোসেন 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষেদ'র সদস্য ছিলেন। এছাড়া বিজন চৌধুরী, রশীদ চৌধুরী, আবদুর রাজ্জাক, আবদুর রহমান ভুইঞা প্রমুখ বিভিন্নভাবে এ আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন বলে জানা যায় (ইমদাদ হোসেন, সাক্ষাৎকার, ৩রা ফেব্রুয়ারি, ২০০৯) (ইসলাম, ১লা ফেব্রুয়ারি, ২০০৯; আকন্দ, ২০০৯, পৃ. ১৭; সোম, ২০১৫, পৃ. ১৫)। শিল্পী মোস্তফা মনোয়ারের কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার। তখন তিনি ছিলেন স্কুলের ছাত্র। থাকতেন নারায়ণগঞ্জে। তারপরও তিনি ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন এবং পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন।

কামরুল হাসানের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়, 'সেকালের পোস্টার লেখার প্রধান মাল-মসলা ছিল পুরাতন খবরের কাগজের ওপর লাল বা কালো রং দিয়ে লেখা স্লোগান। সাধারণত রাজনৈতিক কর্মীরাই সেগুলো লিখতেন। কিন্তু ভাষা আন্দোলনের সময় থেকেই প্রথম আমিনুল ইসলাম, মুর্তজা বশীর, ইমদাদ হোসেন, রশীদ চৌধুরী পোস্টার লিখেছে। এদের তুলির বলিষ্ঠ রেখার পোস্টার শিক্ষাঙ্গনে, রাস্তায়, গলিতে সেঁটে দিয়ে ভাষা আন্দোলনেকে করা হয়েছে আরো প্রাণবন্ত। এছাড়া লেখা হয়েছে শ্লোগানে, দাবিতে আকীর্ণ ব্যানার। আমি নিজেও আমার ছাত্রদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছিলাম' (হক, ১৯৯৮, পৃ. ১৮৫-১৮৬)। আমিনুল ইসলাম জানিয়েছেন, সেসময় পোস্টার লেখার কাজে পুরনো খবরের কাগজ ও পোস্টার পেপার ব্যবহার করা হতো। পোস্টার কালারের দাম বেশি হওয়ার কারণে সাধারণত সস্তা রং দিয়ে পোস্টার লেখার কাজ শেষ করা হতো। বিশেষ কোনো ইমেজ তাতে থাকতো না। তবে মুষ্টিবদ্ধ হাত, ছেঁড়া শেকল ইত্যাদি কখনো কখনো ব্যবহৃত হতো। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির পর থেকে বিভিন্ন ধরনের ইমেজ ব্যবহার করে পোস্টার, ব্যানার, প্লাকার্ড তৈরি করা শুরু হয় (ইসলাম, ১লা ফেব্রুয়ারি, ২০০৯)। আবার ইমদাদ হোসেন মনে করেন, সেসময় যেসব চিত্ররূপ আঁকা হয়েছে এসব পোস্টার-ব্যানারে, তাতে ভারতীয়– বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত ছবির প্রভাব ছিল। তিনি জানান, পোস্টার বা প্ল্যাকার্ড আঁকার কাজে সস্তা কার্টিজ পেপারের পাশাপাশি কখনো কখনো দামি কাগজও ব্যবহার করা হতো (হোসেন, ৩রা ফেব্রুয়ারি, ২০০৯)।

উল্লেখ্য, ১৯৫০ সালে জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে 'ঢাকা আর্ট গ্রুপ' যাত্রা শুরু করেছিল। ১৯৫১ সালে এ গ্রুপ একটি সফল শিল্পকর্ম-প্রদর্শনীর আয়োজন করে। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৫২ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি

ছিল ঢাকা আর্ট গ্রুপের দ্বিতীয় প্রদর্শনীর উদ্‌বোধনের জন্য নির্ধারিত দিন। ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের পাশাপাশি প্রদর্শনীর কাজও এগিয়ে চলছিল। তৎকালীন নিমতলীর ঢাকা জাদুঘরে এ প্রদর্শনী উদ্‌বোধন করার কথা ছিল বাংলার গভর্নরের পত্নী ভিকারুননিসা নূনের। ২১শে তারিখে সেই অনুযায়ী প্রস্তুতিও চলছিল। কিন্তু ২১শে ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলি চালানো ও উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তাৎক্ষণিকভাবে প্রদর্শনী স্থগিত করা হয়। এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কামরুল হাসান। কামরুল হাসানের স্মৃতিচারণে সে-সময়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে চমৎকার বিবরণ পাওয়া যায়:

> তখন বিকেল প্রায় সাড়ে চারটে হবে। হঠাৎ দেখি শিল্পী মুর্তজা বশীর। সারা জামা তার রক্তাক্ত। সে খুবই ভাবপ্রবণ। আমার কাছে এসে হাউ-মাউ করে কেঁদে পড়লো। সালাম, বরকতদের সংবাদ আমি বশীরের কাছ থেকেই প্রথম পেয়েছি। বশীর হাসপাতালে আহত ও মৃতদের বহনকারীদের সঙ্গে ছিল। তার গায়ের জামায় তাদেরই তাজা রক্ত (হক, ১৯৯৮, পৃ. ১৮৭)।

পাশাপাশি, মুর্তজা বশীরের লেখা থেকেও সে-সময়ের প্রত্যক্ষদর্শীর তাজা বিবরণ পাওয়া যায়। জানা যায়, মুর্তজা বশীরসহ আরো কয়েকজন শিল্পী প্রদর্শনী থেকে তাদের ছবি প্রত্যাহার করেছিলেন– তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ হিসেবে। অবশ্য পরে, যখন মার্চ মাসে প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হয়, তাতে তাঁরা অংশ নিয়েছিলেন। উদ্‌বোধন করেছিলেন লেডি ভিকারুননিসা নূন। আমিনুল ইসলামের লেখা থেকে জানা যায়, তিনি ২১শে ফেব্রুয়ারির ঘটনাতে আলোড়িত হয়ে 'হিউম্যানিটি ক্রুসিফাইড' শিরোনামে একটা বেশ বড়ো ছবি এঁকে এই প্রদর্শনীতে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ছবির সিলেকশন কমিটি ওই মুহূর্তে এ ধরনের ছবি প্রদর্শনীতে দেওয়া সমীচীন বোধ করেননি (ইসলাম, ২০০৩, পৃ. ৪৪)।

আমরা লক্ষ করি, বাংলা ভাষার জন্য চারুকলা ইনস্টিটিউটের ছাত্র-শিক্ষকরা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিলেও এ প্রদর্শনী উপলক্ষে যে ক্যাটালগ প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে কিন্তু বাংলার স্থান ছিল না। পুরো ক্যাটালগ ছিল ইংরেজিতে। তৎকালীন প্রেক্ষাপটে এটা হয়তো খুব অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ভাষা আন্দোলনের রেশ কাটার আগেই শিল্প-প্রদর্শনীর ক্যাটালগের ভাষা হিসেবে ইংরেজির আশ্রয় নেওয়া এবং তাতে বাংলার স্থান না হওয়াটা আমাদের ভাবনার খোরাক জোগায় বৈ কি!

এমনকি, রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে যখন আন্দোলন সংগ্রাম চলছে তখনো আমরা দেখি, ঢাকা আর্ট গ্রুপের প্রথম প্রদর্শনী (১৯৫১) উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকার ভাষাও ছিল ইংরেজি। এবং তাতে ইংরেজি ভাষায় লিখিত বক্তব্যে বলা হয়েছে, এ গ্রুপ কোনো বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শ বা নির্দিষ্ট কোনো শিল্পাদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়। এ হচ্ছে শিল্পীদের স্বার্থ রক্ষা ও ছবি আঁকা এবং এর জন্য পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি সংগঠন মাত্র (আজিম, ২০০০, পৃ. ৯৩)।

আরো উল্লেখ করা যেতে পারে, এ প্রদর্শনীর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং প্রদর্শনী উদ্‌বোধন করেছিলেন পূর্ব-পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন, বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতি-বিরোধী হিসেবে যার ব্যাপক পরিচিতি ছিল।

খুব সম্ভবত তৎকালীন প্রেক্ষাপটে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া চারুকলা বিষয়ক কোনো প্রতিষ্ঠান টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না– এই বিবেচনায় সরকারের শীর্ষস্থানীয় ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের আনুকূল্য পাওয়ার চেষ্টা চারুশিল্পীদের এসব কর্মকাণ্ডে বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। যদিও এসব শিল্পী ব্যক্তিগতভাবে বাংলা ভাষা ও

বাঙালি সংস্কৃতির পক্ষের মানুষ ছিলেন– যা তাদের অন্যান্য কার্যক্রম থেকে বুঝে নেওয়া যায়। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিকভাবে, প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের স্বার্থে তৎকালীন প্রেক্ষাপটে তারা একাধিক এমন পদক্ষেপ নিয়েছেন, যাতে তাদের রাজনৈতিক অবস্থান প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। সত্যের খাতিরে এ কথা বলতেই হবে। তবে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে, এধরনের পদক্ষেপকে একধরনের কৌশলও বলা যেতে পারে।

ভাষা আন্দোলনের প্রভাব: পঞ্চাশের দশকের অন্যান্য ঘটনা

১৯৫২'র ভাষা আন্দোলনের প্রভাব পড়েছিল দেশের সব স্তরের মানুষের উপর। শিল্প-সাহিত্যেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। ভাষা আন্দোলনের পরের বছর (মার্চ ১৯৫৩) শহিদ দিবস স্মরণে *একুশে ফেব্রুয়ারী* নামে হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত যে সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছিল (প্রকাশক: মোহাম্মদ সুলতান) তার প্রচ্ছদ করেছিলেন আমিনুল ইসলাম। অলংকরণ করেছিলেন মুর্তজা বশীর ও বিজন চৌধুরী। মুর্তজা বশীরের লিনোকাট মাধ্যমে করা শিল্পকর্মে দেখা যায় নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রতিফলন। গুলিবিদ্ধ তরুণের আহত শরীর আঁকড়ে ধরে আছে আরেক তরুণ সহযোদ্ধা। আহত তরুণের হাতে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে প্ল্যাকার্ড। এ সংকলনে আরো যেসব অলংকরণ রয়েছে তাতে একুশের অভিজ্ঞতার তাজা বিবরণ নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক ঘটনার পরের বছর অর্থাৎ ১৯৫৩ সালে চারুকলা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা একুশের ঘটনা স্মরণে ব্যানার-ফেস্টুন শোভিত একটি শোভাযাত্রা বের করেছিল। শোভাযাত্রায় ভাষা আন্দোলনকে উপজীব্য করে আঁকা একাধিক ব্যানার প্রদর্শিত হয়েছিল। এসব ব্যানারচিত্রের বিষয়বস্তু ছিল প্রধানত ভাষার দাবিতে শিক্ষার্থী-জনতার মিছিল এবং তাতে পুলিশের গুলিবর্ষণের ঘটনা। সে সাথে 'বাক স্বাধীনতা চাই', 'গ্রেফতারী পরোওয়ানা প্রত্যাহার করো'– এসব শ্লোগান-সমৃদ্ধ সচিত্র প্ল্যাকার্ড ও ফেস্টুন তাঁরা বহন করেছিলেন।

ভাষা আন্দোলনের ঘটনাকে উপজীব্য করে দৈনিক পত্রিকায় কার্টুন প্রকাশিত হয়েছিল। 'দোপেয়াজা' ছদ্মনামে কার্টুনগুলি শিল্পী কাজী আবুল কাসেমের আঁকা। এসব কার্টুনে তৎকালীন বিভিন্ন গোষ্ঠীর চরিত্র ও অবস্থান ব্যঙ্গবিদ্রুপের মাধ্যমে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

ভাষা আন্দোলনেরই প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে শহিদ মিনারের কথা বলা যেতে পারে। হামিদুর রাহমান এবং নভেরা আহমেদের পারিকল্পনা ও ডিজাইনে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার গড়ে উঠেছিল পঞ্চাশের দশকের শেষার্ধে (১৯৫৬-১৯৫৮)। যদিও রাজনৈতিক উত্থান-পতনের কারণে একাধিকবার এই শহিদ মিনার তৈরির কাজ বাধাগ্রস্ত হয়েছিল এবং শিল্পীদ্বয়ের পরিকল্পিত নকশা অনুসারে এ কাজ কখনো সম্পূর্ণ হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে, তবু এ শহিদ মিনারকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে পঞ্চাশের দশক থেকেই, যা তখন থেকে এখন পর্যন্ত বাঙালি জাতীয়তাবাদের অন্যতম স্মারক ও প্রেরণার উৎস। এই মডেলের অনুসরণে পরবর্তীকালে অজস্র শহিদ মিনার গড়ে উঠেছে দেশের ভিতরে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। বিশেষ করে, ১৯৯৯ সালে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পাবার পর একুশে ফেব্রুয়ারি ও শহিদ মিনারের গুরুত্ব ও তাৎপর্য আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার ছাড়াও আরো অনেক শহিদ মিনার সৃষ্টিতে শিল্পীদের ভূমিকা ছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হল চত্বরে যে শহীদ মিনার, তার ডিজাইন করেছিলেন জয়নুল আবেদিন স্বয়ং (নজরুল, ১৯৯৫, পৃ. ৫৪)।

ভাষা আন্দোলনকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষকাল বলা যেতে পারে। এর প্রভাব দেখা যায় ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে। পাকিস্তান সৃষ্টির সাত বছর পর প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। '৫৪'র নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয়লাভ ও মুসলিম লীগের ভরাডুবি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এ নির্বাচনে চারুশিল্পীরা যুক্তফ্রন্টের পক্ষে প্রচারণায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। কামরুল হাসানের লেখা থেকে জানা যায়, '১৯৫৪ সালের নির্বাচন উপলক্ষে যুক্তফ্রন্টকে সমর্থন দানের ভিত্তিতে শিল্পীরা যে উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে হাজার হাজার দেওয়ালচিত্র, ব্যানার, এবং ছবি এঁকেছিল তা আমার স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করছে' (হক, ১৯৯৮, পৃ. ১৯০)। নমুনার অভাবে কেমন ছিল সে-সব দেয়ালচিত্র বা ব্যানারের চিত্রভাষা– তা নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবে প্রবীণ শিল্পীদের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়, সে সময়ের কাজগুলো ছিল মূলত নির্বাচনমুখী। রাজনৈতিক নেতাদের অনিয়ম ও দুর্নীতি (যেমন ঘুষ নেওয়া), পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি ইত্যাদি ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে চিত্রিত করা হতো এসব পোস্টার, ব্যানার বা দেয়ালচিত্রে (হোসেন, ২০০৯; আকন্দ, ২০০৯, পৃ. ২১)।

ভাষার প্রশ্নে পূর্ব-বাংলার গণমানুষের ভেতর যে জাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল তাতে চারুশিল্পীরাও উজ্জীবিত হয়েছিলেন এবং জনগণকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী মন্ত্রে উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে সপ্তাহব্যাপী যে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা ছিল সে-সময়ের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেক কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী এ উপলক্ষ্যে ঢাকা এসেছিলেন। এ বিষয়ে কামরুল হাসানের মূল্যায়ন ও স্মৃতিচারণ প্রণিধানযোগ্য:

> আমার বিবেক-বিবেচনা দিয়ে অনেক পথ অতিক্রম করে এসে আজ এটা পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পারছি যে '৫৪ সালের এ সাহিত্য সম্মেলনই ছিল বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রারম্ভিক প্রবাহ। এ প্রবাহ প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের দুর্গে প্রচণ্ড আঘাত হানতে পেরেছিল। এর প্রমাণ পাওয়া যাবে সেই সময়কার *দৈনিক আজাদ* পত্রিকার পৃষ্ঠায়। প্রায় দুই মাস ধরে আজাদের পৃষ্ঠায় দুই কলাম হেডিং-এ প্রতিদিন আমাদের এই সম্মেলনের বিরুদ্ধে শুধু বিদ্বেষপ্রসূত বিষোদ্গারই ছিলো না, এতে অশালীন ভাষাও প্রয়োগ করা হতো। আমরা অর্থাৎ সম্মেলনের উদ্যোক্তা ও সমর্থকরা যে ভারতীয় দালাল এবং ইসলামবিরোধী এটাই ছিল তাদের মূল বক্তব্য। বাংলাদেশের বেশিরভাগ শিল্পী কেবল সেই মহাসম্মেলন উপলক্ষে চিত্র প্রদর্শনী করেই দায়িত্ব পালন করেনি বরং পোস্টার, পুস্তিকা, মঞ্চসজ্জা থেকে ছায়া নাট্যের পটভূমিতেও সক্রিয় ছিল (হক, ১৯৯৮, পৃ. ১৯১)।

এ সাংস্কৃতিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে বর্ধমান হাউসে যে আলোকচিত্র ও শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল, তা উদ্‌বোধন করেছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন।

১৯৫৫ সালের আগস্ট (১৪-২১) মাসে পাকিস্তান আর্ট কাউন্সিলের আয়োজনে জয়নুল আবেদিনের উদ্যোগে চারুকলা ইনস্টিটিউটে লোকশিল্পের এক বিশাল প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। সম্ভবত সেটাই ছিল বাংলাদেশে প্রথম লোকশিল্প প্রদর্শনী। সারা দেশ থেকে লোকশিল্পের বিভিন্ন নিদর্শন সংগ্রহ করে এ প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছিল। যার মধ্যে ছিল নকশিকাঁথা, শিকা, জামদানি, বাঁশ ও বেতের তৈরি জিনিস, ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্প

ইত্যাদি (*দৈনিক আজাদ*, ১৯৫৫, ১৬ই আগস্ট)। সরাসরি রাজনৈতিক বক্তব্য না থাকলেও এ প্রদর্শনীর ভেতর দিয়ে বাঙালি সংস্কৃতিকে সবার সামনে তুলে ধরা হয়েছিল– যা পরোক্ষভাবে একুশের চেতনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যা বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল।

পঞ্চাশের দশকেই ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে টাঙ্গাইলের কাগমারীতে পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগের বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন উপলক্ষে সেখানে এক সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। তাতে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী ছাড়াও বিদেশি অনেক প্রতিনিধি অংশ নিয়েছিলেন। এ সম্মেলনের পোস্টার আঁকার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল আর্ট ইনস্টিটিউটের শিল্পীদের। জয়নুল আবেদিন, শফিকুল আমিন, কামরুল হাসানের নেতৃত্বে একদল শিল্পী এ সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল সন্তোষের রাজবাড়িতে (মকসুদ, ২০১৭, পৃ. ১৩৬-১৩৭)। হাশেম খানসহ আর্ট ইনস্টিটিউটের ৩০ জন শিক্ষার্থী এতে অংশ নেয়। কাগমারী এলাকায় বসবাসরত সাধারণ মানুষের জীবন সম্পর্কে প্রদর্শনীর আগে তাৎক্ষণিকভাবে এসব চিত্রকর্ম আঁকা হয়েছিল। ফলে দেখা যাচ্ছে, ভাষা আন্দোলন থেকে যে সম্পর্কের সূত্রপাত– প্রাতিষ্ঠানিক চারুশিল্পীদের সঙ্গে তৎকালীন বাঙালি জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের একধরনের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে পঞ্চাশের দশকেই।

ষাটের দশকের বিভিন্ন আন্দোলন ও চারুশিল্পী সমাজ

বাংলাদেশের আন্দোলন-সংগ্রামের ইতিহাসে ষাটের দশক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশে যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল, তা ষাটের দশকেই নানাভাবে আরো স্পষ্ট ও প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল।

মোটামুটি ১৯৬২ থেকে বিভিন্ন ইস্যুকে সামনে এনে আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছিল। বিভিন্ন ঘটনার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগের ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষিত হলে এ আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনই প্রথমে স্বাধিকার ও পরে স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নেয়। তবে সে আলোচনায় প্রবেশের আগে আরেকটি আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

১৯৬২ সালে যখন ছাত্রদের নেতৃত্বে আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছে, তখন প্রায় একই সময়ে ঢাকার সরকারি আর্ট ইনস্টিটিউটেও আরেকটি বিশেষ আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিল। সেটা হলো সরকারি আর্ট ইনস্টিটিউটকে পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রি কলেজে রূপান্তরিত করার আন্দোলন। ১৯৬২ সাল নাগাদ এ আন্দোলন তুমুল আকার ধারণ করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে নামের সঙ্গে 'ইনস্টিটিউট' শব্দটি যুক্ত থাকলেও ঢাকার সরকারি আর্ট ইনস্টিটিউটটি সরকারি কাগজপত্রে স্কুল হিসেবেই পরিগণিত হতো। তখন এখানে পাঁচ বছরের সার্টিফিকেট কোর্স চালু ছিল। অর্থাৎ এখানে শিক্ষা লাভ করলে একজন শিক্ষার্থী যে সার্টিফিকেট লাভ করতেন, তা ডিগ্রির সমতুল্য ছিল না। ষাটের দশকের গোড়ায় যারা এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ছিলেন, তারা সার্টিফিকেট কোর্সের পরিবর্তে ডিগ্রি প্রদানের দাবিতে চারুশিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রি কলেজে পরিণত করার আন্দোলন শুরু করে। ছাত্রদের ভেতর এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন আনোয়ার হোসেন, প্রফুল্ল রায়, কেরামত মওলা, সামসুল ইসলাম নান্টু, মুনশী মহিউদ্দিন, বেলাল আহমেদ, আর. এস. এম. সালাম প্রমুখ। এছাড়া আর্ট ইনস্টিটিউটের সঙ্গে সম্পৃক্ত অনেকেই কমবেশি এ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আর্ট ইনস্টিটিউটের বাইরের অনেকের সহযোগিতাও পাওয়া যায় এ আন্দোলনে। এ প্রসঙ্গে কমরেড রবি

নিয়োগী, কমরেড মোহম্মদ ফরহাদ, কবি বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তৎকালীন ডাকসুর নেতৃবর্গও এ আন্দোলনের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

তবে আন্দোলনের গতিবৃদ্ধিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তৎকালীন তরুণ শিক্ষক শিল্পী মোস্তফা মনোয়ার। বিভিন্ন কার্টুন সমৃদ্ধ পোস্টারগুলোর মাস্টার কপিটি তিনিই অঙ্কন করতেন। শিক্ষার্থীরা সেগুলোর অসংখ্য কপি করে সারা শহরে ছড়িয়ে দিতো। সে-সময়ের স্মৃতিচারণ করে শিল্পী মোস্তফা মনোয়ার জানান, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি শিখেছিলেন যে, কার্টুন বা ছবি আঁকা দিয়ে মানুষের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা যায়। সে অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আর্ট ইনস্টিটিউটকে কলেজে রূপান্তরিত করার আন্দোলনেও তিনি বিভিন্ন বক্তব্যসমৃদ্ধ কার্টুন আঁকার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছিলেন (মনোয়ার, ২০০৯)। এ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা আনোয়ার হোসেনের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়:

> আন্দোলন চলতে থাকে।... এদিকে কার্টুনে, পোস্টারে ভরে ওঠে সারা শহর। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে বৈষম্য, স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের ছাত্রাবাসের অভাব, সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় বিষাক্ত ছোবল। ভুড়িওয়ালা কেন্দ্রীয় সরকার ঐ পাকিস্তানের কামিজ পরিহিতা অলংকার ও প্রসাধনে ফিটফাট মহিলাকে মূল্যবান হার পরিয়ে দিচ্ছে। পাশেই এই পাকিস্তানের শাড়ী পরা অলংকারহীন মহিলা শীতে থর থর করে কাঁপছে। তার দিকে দৃষ্টি নেই। ছাত্রাবাসে জায়গা নেই। ছোট ঘরে উঁচু হয়ে ঠেলাঠেলি করে ঢুকছে ছাত্ররা। সাংবাদিকদের কলমের উপর বড় বড় নখ ও পশমওয়ালা কালো হাতের ছোবল। জনতার হাত বাঁধা, মুখে তালা। শামুকের পিঠে সরকারী ফাইল – ইত্যাদি অংকিত হয়ে রেখাচিত্রে, পোস্টারে লিপিকলার সাথে... (হোসেন, ১৯৯৮, পৃ. ২০৯-২১০)।

আন্দোলনের ফলে প্রায় ৬৬ দিন (মতান্তরে ৬২ দিন) ইনস্টিটিউট বন্ধ থাকে। সরকারি কর্তৃপক্ষ বিভিন্নভাবে ছাত্রদের ধর্মঘট প্রত্যাহারের জন্য চাপ সৃষ্টি করলেও তা সফল হয়নি। শেষ পর্যন্ত আটজন ছাত্রকে এই আন্দোলনের কারণে বহিষ্কার করা হয়। তারপরও আন্দোলন চলতে থাকে এবং অবশেষে দীর্ঘ আন্দোলনের পর সরকারের তরফ থেকে দাবি মেনে নিয়ে আর্ট ইনস্টিটিউটকে সরকারি আর্ট কলেজ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৬৩ সাল থেকে 'সরকারী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়' নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এই চারুশিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু করে এবং বিএফএ বা ব্যাচলর অব ফাইন আর্টস ডিগ্রি চালু হয়। আর্ট কলেজে রূপান্তরিত করার এ আন্দোলন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং এর ফল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী হয়েছিল।

কলেজে রূপান্তরিত করার আন্দোলনের ফলে তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে, বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক ছাত্রনেতাদের সঙ্গে আর্ট ইনস্টিটিউটের ছাত্র-শিক্ষকদের গভীর সখ্য তৈরি হয়। পরবর্তী পর্যায়ে ষাটের দশকের বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে চারুশিল্পীদের সঙ্গে রাজনৈতিক নেতৃত্বের এ সম্পর্কের প্রভাব পড়েছিল উল্লেখযোগ্য মাত্রায়।

আইয়ুব খানের শাসনামলের প্রথম কয়েকবছর তেমন কোনো প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। কিন্তু ক্রমশ বিভিন্ন ইস্যুকে কেন্দ্র করে অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে। ১৯৬২ সালের শুরু থেকেই আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ঝিমিয়ে পড়া রাজনৈতিক অঙ্গনে বাষট্টির ছাত্র-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে নতুন প্রাণসঞ্চার হয়। ক্রমশ তা রাজনৈতিক চেহারা নেয় এবং আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়। এ আন্দোলনেও বাংলাদেশের চারুশিল্পীদের ভূমিকা ও অংশগ্রহণ ছিল সক্রিয় ও উজ্জ্বল। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পর থেকেই কার্টুন বা ছবি এঁকে পোস্টার, ফেস্টুন বা ব্যানার করার যে চল তৈরি হয়েছিল, তা

ষাটের দশকের আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনে আরো বৃদ্ধি পায়। আর্ট কলেজ করার আন্দোলনে যেমন শিল্পীরা এ পদ্ধতি বা কৌশল ব্যবহার করেছিল, তেমনি জাতীয় রাজনৈতিক ইস্যুতেও তারা চিত্রিত পোস্টার, প্ল্যাকার্ড বা ফেস্টুন তৈরি করার ধারা অব্যাহত রাখে। সে সময়ের একটি আলোকচিত্রে দেখা যায়, শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে একটি মিছিলের প্ল্যাকার্ড ও পোস্টারগুলিতে 'স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক', 'গণতন্ত্র কায়েম কর', 'ডলারের বন্ধন ছিন্ন কর' ইত্যাদি স্লোগানের পাশাপাশি শেকল ছিঁড়ে বের হয়ে আসছে গতিশীল মানুষ এমন ছবিসহ বিভিন্ন ধরনের ব্যঙ্গচিত্র স্থান পেয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন মিছিলে যেসব পোস্টার, ব্যানার, প্ল্যাকার্ড ইত্যাদি দেখা যায়, তা চারুশিল্পীদের অবদান। সে সময়ের সক্রিয় চারুশিল্পীদের সঙ্গে আলাপের ভিত্তিতে জানা যায়, তখন তারা বিভিন্ন বিষয়ে অজস্র পোস্টার, ফেস্টুন ইত্যাদি এঁকেছিল। কিন্তু মূল নিদর্শনের অভাবে সেসব পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুন ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করাটা বেশ দুরূহ।

১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে দুটি বড়ো ঘটনা ঘটে। প্রথমত জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। এ নির্বাচনে প্রমাণিত হয়ে যায় যে আইয়ুব খানের জনপ্রিয়তা পূর্ব-পাকিস্তানে ক্রমহ্রাসমান। দ্বিতীয়ত ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কাশ্মীর প্রশ্নে পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়– পূর্ব-পাকিস্তানে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। এ যুদ্ধ পূর্ব-পাকিস্তানের অধিবাসীদের ভৌগোলিক হুমকির ব্যাপারে সচেতন করে তোলে এবং তাদের মনে নিরাপত্তাহীনতার জন্ম দেয়। এ পরিস্থিতি পূর্ব-পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবির পক্ষে বাস্তবভিত্তিক যুক্তি জুগিয়েছিল। এছাড়া যুদ্ধ চলাকালীন রবীন্দ্রসংগীত-বিরোধী উদ্যোগ এবং পশ্চিমবাংলা থেকে সাংস্কৃতিক উপাদান ও প্রকাশনা আমদানি নিষিদ্ধকরণ বাঙালি সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যের উপর আঘাত হিসেবে গণ্য করা হয়। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের অভিজ্ঞতাও তাদের নতুন করে ভাবতে অনুপ্রাণিত করে এবং বাঙালি সাংস্কৃতিক পরিচয়টি সামনে চলে আসে। এসব কারণে ষাটের দশকের প্রথমার্ধে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা আরো বিকশিত হতে থাকে। এর নানা নজির আমরা দেখতে পাই সে-সময়ের বিভিন্ন সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে। উদাহরণ হিসেবে ছায়ানটের কথা বলা যেতে পারে (প্রতিষ্ঠা ১৯৬১)। ১৯৬৪ থেকে ছায়ানট বর্ষবরণ অনুষ্ঠান শুরু করলেও কয়েকবছর পর এ অনুষ্ঠান রমনার বটমূলে আয়োজন করা হয় এবং তারপর থেকে প্রতিবছর নিয়মিতভাবে বর্ষবরণ উৎসব উদ্‌যাপন করতে শুরু করে। সন্‌জীদা খাতুন লিখেছেন, ''১৯৬৭ সাল থেকে শুরু হলো রমনার বর্ষবরণ অনুষ্ঠান।... চারুকলা ইনস্টিটিউটের ছাত্রছাত্রীরা হাতে লিখে কিছু আমন্ত্রণপত্র তৈরি করল'' (খাতুন, ২০১৭, পৃ. ১৪)। অর্থাৎ ছায়ানটের কার্যক্রমের সাথেও চারুকলার শিল্পীদের একটা সম্পৃক্ততা ছিল। এ প্রতিষ্ঠানের আয়োজনে রবীন্দ্র ও নজরুল-জয়ন্তী, বসন্ত উৎসব ইত্যাদিও নিয়মিতভাবে পালিত হতে থাকে।

আর্ট ইনস্টিটিউটেও তখন ছবি আঁকার পাশাপাশি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে। কলকাতা আর্ট কলেজ থেকে পাস করে শিল্পী মোস্তফা মনোয়ার তখন তরুণ শিক্ষক হিসেবে ঢাকার আর্ট ইনস্টিটিউটে যোগ দিয়েছেন। তাঁর উদ্যোগে আর্ট ইনস্টিটিউটে প্রথম নাটক হয়েছে– রবীন্দ্রনাথের *ডাকঘর*। হয়েছে নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বসন্ত উৎসব ইত্যাদি।

সংবাদ, *ইত্তেফাক* ইত্যাদি পত্রিকা এবং কচি-কাঁচার মেলা (প্রতিষ্ঠা ১৯৫৬), খেলাঘর প্রভৃতি শিশু-সংগঠনগুলো এ সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এসব সংগঠন বা পত্রিকার সাথে জড়িত ছিলেন অনেক চারুশিল্পী। যেমন হাশেম খান, রফিকুন নবী, শাহাদত চৌধুরী প্রমুখ। বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকা বা একুশের সংকলনকে কেন্দ্র করেও কবি বা লেখকদের সঙ্গে চিত্রশিল্পীরা বাঙালি সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশে

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। কেননা এসব পত্রিকা বা সংকলনের প্রচ্ছদ ও অলংকরণের কাজটা চিত্রশিল্পীরাই করতেন।

প্রকৃতপক্ষে ষাটের দশকের গোড়াতেই এমন একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছিল যাতে কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষার্থী, রাজনীতিবিদ প্রমুখসহ বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণির মানুষের ভেতর এক ধরনের যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়েছিল। তাদের সম্পর্কের অন্যতম ভিত্তি ছিল আইয়ুব-বিরোধী মনোভাব ও বাঙালি সাংস্কৃতিক চেতনা। বাঙালি সাংস্কৃতিক চেতনাই ক্রমশ পাকিস্তানি ভাবাদর্শের বিপরীতে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে আরো শক্তিশালী করে তোলে। এটা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে ১৯৬৬ সালে।

১৯৬৬ সালে লাহোরে সর্বদলীয় সম্মেলনে পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতিনিধি দলের প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ছয়-দফা প্রস্তাব হাজির করেন। ছাত্র-বুদ্ধিজীবী ছাড়াও পূর্ব-পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের কাছে ছয়-দফা খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ছয়-দফাকে পূর্ব-পাকিস্তানের অধিকাংশ মানুষ তাদের মুক্তির সনদ হিসেবে বিবেচনা করেছিল। ছয়-দফার কারণেই শেখ মুজিব পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষের কাছে অসাধারণ গ্রহণযোগ্যতা এবং শীর্ষ-নেতার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। বোধগম্য কারণেই, লাহোরে ছয়-দফা প্রস্তাব হাজির করার পর আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে পূর্ব-পাকিস্তানে ছয় দফার পক্ষে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়েছিল। আর এই প্রচারণার কাজে– পোস্টারে, ব্যানারে, জনসভার মঞ্চসজ্জা ইত্যাদিতে ছয়-দফার যে লোগো ব্যবহৃত হয়েছিল, তার ডিজাইন করেছিলেন শিল্পী হাশেম খান। সে-সময়ের স্মৃতিচারণ করে শিল্পী হাশেম খান জানিয়েছেন, খুব সহজ-সরল ফর্মে করা হয়েছিল ছয়-দফার লোগো ডিজাইন। বাংলাদেশ ছয় ঋতুর দেশ। বাংলাদেশের মানুষের জীবনে ছয় ঋতুর প্রভাব ব্যাপক। এ দেশের মানুষের স্বকীয় স্বভাব, মন-মেজাজ ইত্যাদি গড়ে উঠেছে ছয় ঋতুর কল্যাণে। এ ছয় ঋতুর কথা মাথায় রেখে ছয়-দফার লোগো ডিজাইন করা হয়েছিল বলে তিনি জানিয়েছেন (খান, ১৪ই মে, ২০০৯)। পরবর্তীকালে বীরেন সোম জানিয়েছেন, হাশেম খানের লে-আউট অবলম্বনে তিনি, আবুল বারক আলভী ও মঞ্জুরুল হাই– এ তিনজন মিলে ৬-দফার মঞ্চ বানাবার কাজ সম্পন্ন করেন। এ মঞ্চ থেকেই ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ৬-দফা কর্মসূচি ব্যাখ্যা করেন (সোম, ২০১৫, পৃ. ৪৬-৪৭)।

ছয় দফা এবং শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে আইয়ুব খানের সরকার দমননীতির আশ্রয় নেয়। রাজনীতিক ও ছাত্র-জনতার উপর নেমে আসে অমানুষিক নির্যাতন। সংবাদপত্রের উপর কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। ১৯৬৬ সালেই শেখ মুজিব গ্রেফতার হয়ে যান এবং ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত তিনি অধিকাংশ সময় কারাবন্দি থাকেন। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারিতে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়। এ মামলার বিরুদ্ধে শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থান ঘটে। ইতিহাসে এটাই ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান হিসেবে পরিচিত। দুর্বার গণ-আন্দোলনের মুখে ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে শেখ মুজিব ও অন্য বিরোধী নেতাদের আইয়ুব খান বিনা শর্তে মুক্তি দেন। পরের মাসে, মার্চে পরিস্থিতি সামলাতে রাওয়ালপিন্ডিতে শুরু হয় গোল-টেবিল বৈঠক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আইয়ুব খান ক্ষমতা ধরে রাখতে পারে না। মার্চ মাসেই সামরিক বাহিনীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে আইয়ুব খান দায়িত্ব পরিত্যাগ করেন। এভাবে আইয়ুব খানের এক দশকের শাসনামলের অবসান হয়। সামরিক বাহিনী ক্ষমতা-গ্রহণের পর দেশে সামরিক শাসন জারি হয় এবং সেনাপ্রধান ইয়াহিয়া খান নিজেকে রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করেন। তিনি

অবিলম্বে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি দেন। এভাবে দেশ এক সেনাশাসকের হাত থেকে আরেক সেনাশাসকের হাতে এসে পড়ে।

মোটাদাগে এই হলো ১৯৬৬-৬৯ এই কালপর্বের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এ কালপর্বে প্রথমে ছয়-দফা এবং পরবর্তীকালে এগারো-দফাকে সামনে রেখে যখন স্বায়ত্তশাসন ও অন্যান্য দাবিতে আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে, তখন চারুশিল্পীরা বিভিন্নভাবে তাতে অংশ নেয়। চারুশিল্পীদের কর্মকাণ্ডের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার।

একুশের চেতনাকে নান্দনিকভাবে উপস্থাপন করার অংশ হিসেবে একুশের আলপনার প্রবর্তন বাংলাদেশের চারুশিল্পীদের বিশেষ অবদান। ভাষা আন্দোলনের পর শহিদ মিনারে ও রাস্তায় আলপনা আঁকার প্রচলন কিছু মাত্রায় চালু হয়েছিল। কিন্তু ১৯৬৭/৬৮ সাল থেকে তা আরো নতুন মাত্রা পায় এবং ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণভাবে আলপনা ও ব্রত-পার্বণ হিন্দু সংস্কৃতির অংশ হিসেবে পরিগণিত হয়। কিন্তু এদেশের চারুশিল্পীরা একুশের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে আলপনাকে বাংলা সংস্কৃতির উপাদান হিসেবে নতুন মাত্রা দিয়ে রাজপথে নিয়ে আসে। একুশের আলপনা এখন বিশেষ ধরনের আলপনা হিসেবে স্বীকৃত– যা বাঙালি সংস্কৃতির অসাম্প্রদায়িক চেতনার চিত্রিত রূপ হিসেবে সারা পৃথিবীতে পরিচিত ও সমাদৃত।

শহিদ মিনার এলাকায় বাঙালি সংস্কৃতি ও আন্দোলনের সপক্ষের বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক বড়ো বড়ো ছবি বা ব্যানার এঁকে তা টাঙিয়ে দিয়ে ব্যানার প্রদর্শনী শুরু হয় ষাটের দশকেই। ক্রমশ এ ব্যানার-প্রদর্শনী জনপ্রিয়তা এবং ব্যাপকতা লাভ করে। '৬৭-তে শুরু হলেও পরবর্তী বছরগুলোতে, অর্থাৎ ১৯৬৮ এবং ১৯৬৯ সালে তা আরো বড়ো আকারে আয়োজিত হয়। আন্দোলনের পক্ষে জনমত গঠনে ব্যানারগুলোর ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। কী ছিল এসব ব্যানারের ছবির বিষয়বস্তু? ভাস্কর সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদের ভাষ্য থেকে সে-সময়ের কিছু বিবরণ পাওয়া যায়:

> ... ঐ সময় প্রথম প্যানেল করার প্রয়াস পাই বাঙালি জাতিসত্তার উপর। বাঁশপাতার কাহিনী বলে একটা বড় ব্যানার করা হয়। ঐ ব্যানার অসাধারণ সুন্দর ছিল। অনেকগুলি অংশে এটা বিভক্ত ছিল। মা ও শিশু... হারিকেনের আলোয় পড়ছে। আকাশে চাঁদ। অ, আ, ক, খ পড়ছে। তারপর দেখা যায় ছেলেটা বড় হয়েছে। বাঁশের কঞ্চি দিয়ে লেখে। আরো একটু বড় হয়ে ছেলেটা স্কুলে যায়। আর অবসর সময়ে সে রাখালদের সঙ্গে গরু চরায় বা রাখালে বাঁশী শোনে। তারপর একসময় ছেলেটা মাট্রিক পাস করলো । বাবা ভাবলো তার সন্তান বড় হয়েছে। শহরে পাঠাবে লেখাপড়া করতে। সেই ছেলে শহরে এসে যখন দেখলো সে যে ভাষায় কথা বলে, লিখতে শিখেছে, সে ভাষায় কথা বলা যাবে না। তখন সে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। একসময় পুলিশের বাঁশের লাঠির আঘাতে সে মারা যায়। এই কাহিনীচিত্র সে সময় অসাধারণ ছিল (খালিদ, ২০০৫)।

ব্যানার-চিত্রের মধ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ হলো 'দুঃখিনী বর্ণমালা' (মতান্তরে বিক্ষুব্ধ/বিদ্রোহী বর্ণমালা)। বাংলা বর্ণমালার বিভিন্ন অক্ষরকে কেন্দ্র করে প্রচলিত ছড়াকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক বক্তব্য দর্শকের সামনে হাজির করা হয়েছিল চিত্রকলার মাধ্যমে। যেমন 'অ'-তে 'অজগর আসছে তেড়ে' এটা খুবই প্রচলিত শিশুতোষ বাক্য। এ শিশুতোষ বাক্যকে কাজে লাগিয়ে যে ছবি আঁকা হয়েছিল– তা কিন্তু পুরোপুরি রাজনৈতিক। ছবিতে দেখা যায়, বিশালাকৃতির এক অজগর– যেটা চালিয়ে বা বহন করে নিয়ে আসছে কয়েকজন পাকিস্তানি পোশাক পরা হিংস্র প্রকৃতির মানুষ। অজগরের হিংস্রতা থেকে এদের হিংস্রতাও

কম নয়। এই ছবিতে যে লেখা ব্যবহার করা হয়েছে তাও গুরুত্বপূর্ণ– 'দেশ স্বাধীন হলো। বিদেশিরা গেল চলে, কিন্তু স্বার্থন্বেষীর পোষা অজগর এলো, ধীর গতিতে লোভের জিভ বের করে'। ছবির বিষয়বস্তু ও বক্তব্য খুবই পরিষ্কার। এ ধরনের আরো অনেক ছবি আঁকা হয়েছিল এবং তা প্রদর্শিত হয়েছিল শহিদ মিনার চত্বরে। ঠিক কতগুলো ছবি আঁকা হয়েছিল, তা নির্দিষ্ট করে জানা না গেলেও সে সময়কার কিছু কাজের সাদাকালো আলোকচিত্র আমরা দেখেছি। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় সে ধরনের আরো কিছু কাজের বিবরণ দেওয়া হলো।

এ-তে 'এক্কা গাড়ি খুব ছুটেছে'– এই ছবিতে দেখা যায় আরেক চিত্র। মেকি সংস্কৃতি, খাজনা ইত্যাদির ভারে এক্কা গাড়ি ছুটতে তো পারছেই না, বরং এসব চাপিয়ে দেওয়া ভারে এক্কা গাড়ির ঘোড়ার জীবন সংকটাপন্ন। এ ছবির সঙ্গে যে লেখা যুক্ত করা হয়েছে তাও তাৎপর্যপূর্ণ– 'নতুন সড়কে চলতে হবে নতুন চেতনায়, কিন্তু আমাদের জীবন-শকট হাজার বোঝার ভারে এখন অচল'। আবার ঈ-তে 'ঈগল পাখি পাছে ধরে'– এই ছবিতে দেখা যায়, একটা বিশালাকৃতির ঈগল হিংস্র নখর মেলে আক্রমণ-উদ্যত। দুটি সাদা তির তার দিকে ছুটে যাচ্ছে। ছবিতে লেখা হয়েছে, 'সহস্র জনতা বারবার প্রতিহত করেছে সাম্রাজ্যবাদের অশুভ প্রচেষ্টা। কিন্তু ঈগলের রক্ত নখ উদ্যত প্রতিক্ষণে'। উ-তে 'উট চলেছে কোন মুলুকে'– এই ছবিতে দেখা যায়, বিস্তীর্ণ মরুভূমির উপর দিয়ে উট চলেছে। মাথার উপরে গনগনে সূর্য। দূরে মরীচিকার মতো দেখা যাচ্ছে কিছু চীনামাটির তৈজসপত্র। আর দরিদ্র, রুগ্‌ণ, ক্লান্ত একজন বাঙালিকে দেখা যায় কোনোরকমে উটের পিঠের উপর শুয়ে আছে। উটের চলাচলের উপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণই নেই। এ ছবির সঙ্গে ব্যবহৃত লেখাটি ছিল এরকম: 'ঠিক মরীচিকার মতোই শত শত আশ্বাস আমাদের নিয়ে চলেছে কোন মুল্লুকে? মরূদ্যানের সন্ধান কি পাবো না এই মুল্লুকেই?'। ঋ-তে 'ঋষি মশাই বসে পূজায়'– এ ছবিটিও অসাধারণ। এতে দেখা যায়, একজন জটাধারী সাধু ধ্যানে বসে আছে। মানুষের হাড়, খুলি ইত্যাদির পাশাপাশি পিস্তল, রাইফেল নিয়ে সে ধ্যান করছে। এমনকি তার মাথার জটার ভেতরেও একটা পিস্তল গুজে রাখা। পাশে আগুন জ্বলছে। আর তাতে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হচ্ছে 'গণতন্ত্র চাই', 'ভাত চাই' ইত্যাদি লেখা পোস্টার, ফেস্টুন। এ ছবির সঙ্গে লেখা ছিল– 'মৌনীবাবা কথা বলে না, কানে শোনে না। কিন্তু যখের মতো পাহারা দেয় পুঁজিপতির পুঁজি'। এসব ছবির বিবরণ থেকে আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না, তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রাসঙ্গিক নানা চিত্র শিল্পীদের রং-তুলিতে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে।

এসব ব্যানারচিত্র আঁকার কাজে যারা অংশ নিয়েছেন কিংবা সাংগঠনিক কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তাদের মধ্যে মোস্তফা মনোয়ার, ইমদাদ হোসেন, হাশেম খান, রফিকুন নবী, শাহাদাত চৌধুরী, সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ, মঞ্জুরুল হাই, নাসির বিশ্বাস, প্রাণেশ মণ্ডল, প্রফুল্ল রায়, মতলুব আলী, আনোয়ার হোসেন, মহিউদ্দিন ফারুক, আবুল বারক আলভী, বীরেন সোম প্রমুখ গুরুত্বপূর্ণ। বলাই বাহুল্য, অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের তালিকা আরো দীর্ঘ হবে। আর শিল্পীরা শুধু ছবি এঁকে নয়, আরো নানাভাবে আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন।

আরো কয়েকটি ব্যানারচিত্রের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। যেমন, রশীদ চৌধুরীর আঁকা একটা ব্যানারে দেখা যায়, বাংলার মানুষসহ বাংলার বাঘ, কুমির, গরু, সাপ ইত্যাদি পশু-পাখি, এমনকি ফুল, লতা-পাতা এবং প্রজাপতি– সবাই একসঙ্গে বিদ্রোহ করেছে। বাংলার মানুষ ও প্রকৃতি যে বিদ্রোহ-উন্মুখ– তা এ ছবিতে দারুণভাবে ফুটে উঠেছে। আবার নাম না জানা কোনো এক শিল্পীর আঁকা একটি ব্যানার-চিত্রে দেখা যায়,

চারদিক থেকে এগিয়ে আসা বেয়নেটের আক্রমণের ভেতর দাঁড়িয়ে আছে একটি ব্যানার– 'শহীদ দিবস অমর হোক'। এভাবে দেখা যায়, '৬৯-এর গণ-আন্দোলনের সময় বাংলাদেশের শিল্পীরা আন্দোলনে শরিক হয়েছে বিভিন্নভাবে, তবে শিল্পী হিসেবে রং-তুলি হাতেই তারা অধিক সক্রিয় ছিলেন।

এসব ব্যানার ছাড়াও সেসময় বিভিন্ন দাবি বা বক্তব্য উপস্থিত করে অজস্র পোস্টার, ফেস্টুন বা প্ল্যাকার্ড আঁকা হয়েছিল। এগুলো সাধারণত কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্রসহযোগে করা হতো। সে সময়ের স্মৃতিচারণ করে বীরেন সোম লিখেছেন:

> উনসত্তরের সেই উত্তাল সময়টাতে ঢাকা আর্ট কলেজে জোর আন্দোলন চলছে। তখন কলেজের জিএস ছিল সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ। বৃহত্তর আন্দোলনের স্বার্থে তখন এগারো দফা আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে গেলো আর্ট কলেজের ছাত্ররা। সেসময় ডাকসুর সভাপতি ছিলেন তোফায়েল আহমেদ। এই বৃহত্তরে আন্দোলনে আমাদের ভূমিকা কী হবে – সেটা নিয়ে প্রথম মিটিং হলো ইকবাল হলে, এখন যার নাম সার্জেন্ট জহুরুল হক হল। সেই মিটিংয়ে ছিলেন তোফায়েল আহমেদ, সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক, শাহজাহান সিরাজ, মঞ্জুরুল হাই, আবদুল্লাহ খালিদ, রেজাউল করিম, এবং আরো অনেকে। মিটিংয়ে নিজেদের কর্তব্য নিয়ে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা হলো। এগারো দফার মধ্যে চারুশিল্পীদের কিছু দাবিও সংযোজিত হলো। মিটিংয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নেই, আন্দোলনের জন্য পোস্টার, ব্যানার, ও ফেস্টুন তৈরি করবো। তখন কাজকর্ম নিয়ে নিয়মিত আমাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন আসাদুজ্জামান নূর (নাট্যব্যক্তিত্ব), তিনি তখন ডাকসুর সাংস্কৃতিক সম্পাদক। আরো যোগাযোগ রাখতেন মতিউর রহমান (সম্পাদক, প্রথম আলো), মফিদুল হক (ট্রাস্টি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর), আবুল হাসনাত (সম্পাদক, কালি ও কলম) প্রমুখ। আর্ট কলেজের হোস্টেলে আমরা তখন সারারাত জেগে পোস্টার আঁকি। আমাদের দায়িত্ব ছিলো রোজ এক রিম পোস্টার লেখা। মানে ৫০০টা পোস্টার। তখন আমরা যারা পোস্টার লিখতাম তাদের মধ্যে ছিলো শহীদ কবির, মঞ্জুরুল হাই, আবদুল্লাহ খালেদ, রেজাউল করিম, বিজয় সেন, অলক রায়, হাসি চক্রবর্তীসহ আর্ট কলেজের অনেক ছেলেমেয়ে (সোম, ২০১৫, পৃ. ১৬-১৮)।

কী ছিল সে-সব পোস্টার বা প্ল্যাকার্ডের বিষয়বস্তু? এ বিষয়ে খুব বেশি তথ্য আমাদের হাতে নেই। তবে যেসব আলোকচিত্রে সে-সময়কার কিছু কিছু পোস্টার বা ফেস্টুন দেখা যায়, তার কয়েকটা নিয়ে আলোচনা করলে কিছুটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে। যেমন ১৯৬৮ সালের একটি মিছিলের আলোকচিত্রে দেখা যায় '২০ টাকা মন দরে চাউল চাই' দাবি জানিয়ে আঁকা প্ল্যাকার্ডে অনেকগুলি চাউলের বস্তার ছবি আঁকা হয়েছে। আর সে বস্তার উপর বসে আছে পেটমোটা একটা লোক– হয়তো চাউলের আড়তদার। আবার পাশের প্ল্যাকার্ডে 'স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে'– এ দাবির সাথে আঁকা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের কয়েকটি মুখ এবং তার উপরে একটা বিশালাকৃতি হাতুড়ি। যেন মুখগুলিকে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করা হচ্ছে। মুখগুলি পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ এবং হাতুড়িটি এখানে সামরিক শাসনের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ১৯৬৮ সালের আরেকটি মিছিলের আলোকচিত্রে দেখা যায় পোস্টারে আঁকা হয়েছে ভিক্ষার থালা হাতে অপুষ্টিতে ভোগা নিরন্ন শিশুর ছবি। নিচে লেখা 'বুলেট না খাবার দে'। পাশের পোস্টারে বন্ধন ছিন্নরত প্রতিবাদী মানুষের ছবি আঁকা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন রকমের বক্তব্য-সমৃদ্ধ পোস্টার বা প্ল্যাকার্ডে প্রাসঙ্গিক ছবি বা ব্যঙ্গচিত্র আঁকা হয়েছে ষাটের দশকের বিভিন্ন আন্দোলনে।

উনসত্তরের ফেব্রুয়ারিতে কামরুল হাসান বাংলা একাডেমিতে প্রথম 'অক্ষরবৃক্ষ' উদ্‌বোধন করেন। এ ধরনের শিল্পকর্ম নির্মাণের উদ্যোগ সে-কালের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত অভিনব ও অসাধারণ ছিল। বাংলাদেশের চারুকলার ইতিহাসে স্থাপনাশিল্প বা ইনস্টলেশন আর্টের অন্যতম আদি উদাহরণ হিসেবে এ কাজটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। স্থাপনাশিল্প ছাড়াও কামরুল হাসানের করা বাংলা অক্ষর দিয়ে শাড়ির নকশা উনসত্তরে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল– যার রেশ এখনো বাংলাদেশের সমকালীন ফ্যাশনে দেখা যায়। এসময় কামরুল হাসান নিজের উদ্যোগে প্রচুর পোস্টার এঁকেছেন বলে জানা যায় (হক, ১৯৯৮, পৃ. ৯১-৯৪)। উনসত্তরেই তিনি আঁকতে শুরু করেন ইয়াহিয়া খানের প্রতিকৃতি, যা আরো পরে পোস্টার হিসেবে ছাপা হয়েছে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে (হক, ১৯৯৮, পৃ. ১৯৪)।

মুক্তিযুদ্ধঃ ১৯৭১

ভাষা আন্দোলন ও একুশের চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে আন্দোলনের সংস্কৃতি চারুকলা ইনস্টিটিউটে গড়ে উঠেছিল পঞ্চাশ ও ষাটের দশকেই। ফলে সত্তরের দশকের শুরুতেই চারুশিল্পীরা আরো সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে যায়। ১৯৭০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে ঢাকার বাঙালি শিল্পীদের নিয়ে 'নবান্ন' শীর্ষক বিরাট প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে জয়নুল আবেদিন 'নবান্ন' শীর্ষক ৬৫ ফুট দীর্ঘ একটি স্ক্রল পেইন্টিং আঁকেন। আবহমান বাংলার কৃষিভিত্তিক সমৃদ্ধ গ্রামীণ জীবনের আনন্দ-বেদনার কাব্য ফুটিয়ে তুলেছিলেন তিনি এই শিল্পকর্মে। ১৯৭০ সালের এপ্রিল মাসে 'কালবৈশাখী' শীর্ষক আরেকটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল এদেশের শিল্পীরা। দুটি প্রদর্শনীই অনুষ্ঠিত হয়েছিল পাকিস্তান আর্ট কাউন্সিলের (বর্তমানে শিল্পকলা একাডেমি) গ্যালারিতে।

১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে কয়েক লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটে। জয়নুল আবেদিন দুর্গত এলাকা ঘুরে এসে বেশ কিছু স্কেচ আঁকেন এবং পরবর্তীকালে (১৯৭২-৭৩) 'মনপুরা ৭০' শীর্ষক ৩০ ফুট দীর্ঘ স্ক্রল চিত্র আঁকেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত পূর্ব-বাংলায় পাকিস্তান সরকার ত্রাণ-ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগ প্রতিরোধে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। এ দুর্যোগের পরের মাসে অর্থাৎ ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং আওয়ামী লীগ সমগ্র পাকিস্তানে মোট ১৬০টি আসনে জয়লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু পাকিস্তান সরকার নানা কূটকৌশল অবলম্বন করে ক্ষমতা হস্তান্তরে বিলম্ব ঘটায়। অবশেষে ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার পর ঢাকাসহ সারা দেশ উত্তাল হয়ে উঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন পতাকা উত্তোলন করে। গাওয়া হয় 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি । অবশেষে ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন 'তোমাদের যা-কিছু আছে, তা-ই নিয়ে প্রস্তুত থাক। রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ্‌। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম– এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম'।

বঙ্গবন্ধুর এই ঐতিহাসিক ভাষণ বাঙালির মনে স্বাধীনতার নতুন দীপশিখা জ্বালিয়ে দেয়। এদেশের শিল্পীসমাজও তাতে প্রবলভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে গঠিত হয়েছিল 'বাংলা চারু ও কারুশিল্পী সংগ্রাম পরিষদ'। এর যুগ্ম আহবায়ক ছিলেন শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী ও মুর্তজা বশীর। ১৯৭১

সালের মার্চ মাসে এ পরিষদের ব্যানারে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে একটি সমাবেশ ও মিছিলের আয়োজন হয়। সমাবেশে জয়নুল আবেদিন ও মুর্তজা বশীর বক্তৃতা করেন। জয়নুল আবেদিন বলেন, ''এবারকার এই গণজাগরণে আমরা বাংলাদেশের সত্যিকারের চেহারা দেখতে পেয়েছি। দেখেছি কিভাবে দেশের সবুজ মাঠ আমার ভাইয়ের রক্তে লাল হয়ে উঠেছে''। তিনি আরো বলেন, ''শিল্পীর তুলি অত্যাচারীর বন্দুকের চাইতে বেশী শক্তিশালী'' (*পূর্বদেশ*, ১৫ মার্চ, ১৯৭১)। মুর্তজা বশীর বলেন, "জনগণের এই মুক্তি-সংগ্রামের সময় কেউ ঘরে বসে থাকতে পারে না।... এই অবস্থায় শিল্পীরা কেবল ঘরে বসে ছবি আঁকলে চলবে না, দেশের এই মুক্তি-সংগ্রামের সাথে শিল্পীদের একাত্ম হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, শিল্পীরা জনগণেরই লোক" (*পূর্বদেশ*, ১৫ মার্চ, ১৯৭১)।

সমাবেশ শেষে কার্টুন, ফেস্টুন, পোস্টার দিয়ে সাজানো একটি মিছিল বের হয় এবং শেষ হয় বাহাদুর শাহ পার্কে। এই মিছিলের সামনে চারজন ছাত্রী 'স্বাধীনতা' শব্দটি লিখে বহন করেছিল– যা ছিল অভূতপূর্ব ঘটনা। এছাড়াও বিভিন্ন ব্যঙ্গচিত্র ও প্লাকার্ডে 'হবু চন্দ্র আর গবু চন্দ্র', 'শোষণমুক্ত বাংলা দেশ কায়েম কর', 'আমার দেশের ফসল নিয়েছ তুমি, আমাকে দিয়েছ সমূহ সর্বনাশ, তোমার ওখানে মরুতে ফসল এলো, শুধু অনাহারে কেটেছে আমার দিন' ইত্যাদি স্থান পেয়েছিল (*পূর্বদেশ*, ১৫ মার্চ, ১৯৭১)। মিছিলের নেতৃত্ব দেন জয়নুল আবেদিন। ছিলেন মুর্তজা বশীর, শফিউদ্দিন আহমদ, কাইয়ুম চৌধুরী, আমিনুল ইসলাম, কবি শামসুর রাহমান প্রমুখ শিল্পী ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ। এছাড়া, ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মওলানা ভাসানীর অনুরোধে জয়নুল ময়মনসিংহের এক জনসভায় যোগ দেন এবং বক্তৃতা করেন। এই সভায় তিনি পাকিস্তান সরকারের দেওয়া 'হেলাল-ই-ইমতিয়াজ' উপাধি বর্জন করেন (হক, ২০১৫, পৃ. ১৫১)।

এদিকে চট্টগ্রামে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কৃতিসেবী প্রতিরোধ সংঘ কর্তৃক 'বাঙলায় বিদ্রোহ' শীর্ষক ছাপাই ছবির ফোলিও প্রকাশ করা হয়। শিল্পী রশীদ চৌধুরীর নেতৃত্বে মোট ছয়জন শিল্পী বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে উপজীব্য করে শিল্পকর্ম তৈরি করেন। এরা হলেন: দেবদাস চক্রবর্তী, সবিহ উল আলম, আনসার আলী, মিজানুর রহিম, সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ এবং রশীদ চৌধুরী। ছাপাই প্লেটের উপর সরাসরি এঁকে তাৎক্ষণিকভাবে ছাপা হয়েছিল ছবিগুলো। মাহমুদ শাহ্ কোরেশী ফোলিওতে এ উদ্যোগ সম্পর্কে লেখেন:

> বাঙলায় আজ বিদ্রোহ। হাজার বছরের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়: বাঙলা যুগে যুগে বিদ্রোহ করেছে– অনাচার, অবিচার আর অনুশাসনের বিরুদ্ধে। জনগণের কল্যাণ কামনায়, জনমানসের মুক্তির জন্যে বাঙালির সংগ্রাম বিরামহীন। ... আজকের বিদ্রোহ আমাদের আগামীদিনের বিপ্লবেরই পূর্বাভাস। বাঙলা দেশের প্রতিটি মানুষ আজ সার্বিক মুক্তির চেতনায় উদ্বুদ্ধ। সে চেতনাকে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে, সে সংগ্রামে পূর্ণ অংশগ্রহণে সংকল্পবদ্ধ দেশের শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সমাজ।

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম বিষয়ে এদেশের শিল্পী সমাজের মনোভাব সহজ-সরল ও স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে এই বয়ানে।

আমরা সবাই জানি, ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চে বাঙালি জাতির স্বাধীনতার আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য, বাঙালি জাতিকে স্তব্ধ করে দেবার জন্য সামরিকবাহিনী নৃশংস অভিযান চালায় নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের উপর। এই কালরাত্রির পর আলোচনার সব পথ বন্ধ হয়ে যায় এবং চূড়ান্ত সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে এবং শুরু হয় মুক্তির জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম– যা মুক্তিযুদ্ধ নামে পরিচিত। স্বাধীনতার জন্য বাঙালির নয়মাস-ব্যাপী এই

মুক্তিযুদ্ধে চারুশিল্পীরা অনেকে সরাসরি রাইফেল হাতে অংশগ্রহণ করেছে। যেমন, শিল্পী শাহাবুদ্দিন, শাহাদাত চৌধুরী, বনিজুল হক, জি এম এ রাজ্জাক এবং আরো অনেকে। অনেকে গোপনে গেরিলাদের সাহায্য করেছেন (যেমন, শিল্পী রফিকুন নবী, শিল্পী আবুল বারক আলভী প্রমুখ) ২৬শে মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে শহিদ হয়েছিলেন আর্ট কলেজের ছাত্র শাহনেওয়াজ, আহত হয়েছিলেন কার্টুনিস্ট ও শিল্পী নজরুল ইসলাম (ইসলাম, ২০২২, পৃ. ১৫)। নিশ্চিতভাবেই এ তালিকা আরো দীর্ঘ হতে পারে। কারো নাম বাদ পড়ে যেতে পারে এ আশঙ্কায় নামের তালিকা দেওয়া থেকে বিরত থাকছি।

প্রবাসী সরকারের আর্ট ও ডিজাইন বিভাগ

১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুরের মুজিবনগরে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও তাজউদ্দীন আহমেদকে প্রধানমন্ত্রী করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়, যার নেতৃত্বে পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হতে থাকে। দলে দলে লোক পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা প্রভৃতি বাংলাদেশের বর্ডার-সংলগ্ন অঞ্চলে আশ্রয় নিতে থাকে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে শরণার্থী শিল্পী-সাহিত্যিকদের নিয়ে 'বাংলাদেশ বুদ্ধিজীবী মুক্তিসংগ্রাম পরিষদ' (বাংলাদেশ লিবারেশন কাউন্সিল অফ ইনটেলিজেনশিয়া) তৈরি হয়েছিল। সে পরিষদের সভাপতি ছিলেন শিল্পী কামরুল হাসান (হক, ১৯৯৮, পৃ. ১০১)। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল এপ্রিল মাসে মুজিবনগর সরকার গঠিত হলে প্রবাসী সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের অধীনে তৈরি হওয়া 'আর্ট ও ডিজাইন বিভাগ'। এ বিভাগের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন শিল্পী কামরুল হাসান। আরো যুক্ত ছিলেন শিল্পী নিতুন কুণ্ডু, দেবদাস চক্রবর্তী, নাসির বিশ্বাস, প্রাণেশ মণ্ডল, বীরেন সোম প্রমুখ (হাসান, ১৯৯৮, পৃ. ১০০)। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অসাধারণ সব পোস্টার তৈরির কৃতিত্ব মূলত এসব শিল্পীর। কামরুল হাসানের বিখ্যাত পোস্টার 'এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে' এ সময়েই করা। শাহরিয়ার কবিরের ভাষায়, 'পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের দানবসদৃশ প্রতিকৃতি-সম্বলিত পোস্টারটি আঁকার ভেতর শিল্পীর রূপকল্পনার গভীরতা ছিল, কলম ও তুলির দক্ষ আঁচড় ছিল, কিন্তু সবচেয়ে বড়ো ছিল শত্রুর প্রতি তার গভীরতম ঘৃণা ও ক্রোধ, যা তিনি প্রতিটি দর্শকের ভেতর সঞ্চার করতে পেরেছিলেন। ... এ যাবতকালে যুদ্ধের যত পোস্টার আমরা দেখেছি, এতটা ঘৃণাসঞ্চারী এবং ক্রোধ উদ্রেককারী দ্বিতীয়টি দেখিনি' (হক, ১৯৯৮, পৃ. ১০০)। আরো অনেক পোস্টারের মাধ্যমে এদেশের চিত্রশিল্পীরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারণায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

এ সময় করা মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক আরো পোস্টারের মধ্যে রয়েছে 'বাংলার হিন্দু, বাংলার খৃষ্টান, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার মুসলমান– আমরা সবাই বাঙালী', 'সদাজাগ্রত বাংলার মুক্তিবাহিনী', 'বাংলার মায়েরা, মেয়েরা সকলেই মুক্তিযোদ্ধা', 'একেকটি বাংলা অক্ষর অ আ ক খ একেকটি বাঙালীর জীবন', 'বাংলাদেশের সম্পদ বৃদ্ধি করুন পাকিস্তানী পণ্য বর্জন করুন', 'বাংলাদেশের কৃষক শ্রমিক ছাত্র যুবক সকলেই আজ মুক্তিযোদ্ধা', 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম', 'রক্ত যখন দিয়েছি আরও রক্ত দেবো' প্রভৃতি।

কামরুল হাসানের নেতৃত্বে যৌথভাবে শিল্পীরা এ কাজগুলো করতো। পোস্টারগুলোর মধ্যে যাদের ড্রয়িং ভালো তারা ড্রইংয়ের কাজ করতো, আর যাদের লেটারিং ভালো তারা লেটারিংয়ের কাজ করতো (সোম, ২০১৫, পৃ. ২৩)। এখান থেকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় মনোগ্রাম, পোস্টার, কার্টুন, লিফলেট, ব্যানার-ডিজাইন ইত্যাদিও করা হতো (সোম, ২০১৫, পৃ. ২২)।

১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতার বিড়লা একাডেমিতে বাংলাদেশি শিল্পীদের এক যৌথ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। এ প্রদর্শনী আয়োজনে কামরুল হাসানের ভূমিকা ছিল প্রধান (হক, ১৯৯৮, পৃ. ১০১)। বীরেন সোম জানিয়েছেন:

> ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১ বিড়লা একাডেমিতে এই প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত ভাস্কর শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী।... প্রদর্শনীতে শিল্পী কামরুল হাসান, মুস্তাফা মনোয়ার, দেবদাস চক্রবর্তী, নিতুন কুণ্ডু, প্রাণেশ মণ্ডল, নাসির বিশ্বাস, বীরেন সোম, রণজিৎ নিয়োগী, আবুল বারক আলভী (ক্যাটালগে তার নাম ছাপা হয়েছিল কিন্তু তিনি শিল্পকর্ম জমা দিতে পারেননি। প্রদর্শনীর আগেই তিনি পাক হানাদার বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন এবং জুলুম-নির্যাতনের শিকার হন), গোলাম মাহাম্মদ, স্বপন চৌধুরী, কাজী গিয়াসউদ্দিন, চন্দ্রশেখর দে, হাসি চক্রবর্তী, বিজয় সেন, বরুণ মজুমদারসহ ১৭ জন শিল্পীর ৬৬টি ছবি স্থান পেয়েছিল। ছবিগুলো তেলরং, জলরং, কালি-কলম মিশ্র মাধ্যমে আঁকা হয়েছিল (সোম, ২০১৫, পৃ. ৬৬)।

কলকাতায় সন্‌জীদা খাতুন ও ওয়াহিদুল হকের নেতৃত্বে যে গানের দল তৈরি হয়েছিল, তাতে যুক্ত ছিলেন শিল্পী মোস্তফা মনোয়ার, গোলাম মওলা, বীরেন সোম, স্বপন চৌধুরী প্রমুখ। এ গানের দল ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে গান পরিবেশন করতো। এর উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় জনগণের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে সহানুভূতি ও সহমর্মিতার উদ্রেগ করা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল অটুট রাখা। চিত্রশিল্পীদের কাজ ছিল সেট ডিজাইন ও ব্যাকসিন আঁকা। মোস্তফা মনোয়ারের নির্দেশনায় বীরেন সোম ও গোলাম মওলা এসব সেট ডিজাইন করতেন (সোম, ২০১৫, পৃ. ২১)। মোস্তফা মনোয়ারের অন্য আরেকটি উদ্যোগ হলো পাপেট-শো। শরণার্থী শিবিরগুলোতে বিমর্ষতা কাটিয়ে কিছুটা স্বস্তি ও আনন্দ দিতে তিনি পাপেট-শো করতেন। এছাড়াও তিনি ১৯৭১ সালে শারদীয় *দেশ* পত্রিকায় অলংকরণ করেছিলেন বলে জানা যায়।

প্রবাসী বাংলাদেশি শিল্পীদের মধ্যে লন্ডনে শিল্পী এ কে এম আবদুর রউফের কর্মকাণ্ড বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে লন্ডনে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সমাবেশ ও শোভাযাত্রার জন্য ব্যানার, পোস্টার, প্ল্যাকার্ড ইত্যাদি তৈরি করে দিতেন এবং সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। *বাংলাদেশ সংবাদ পরিক্রমা* নামে একটি পত্রিকা তিনি হাতে লিখে প্রকাশ করতেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বিভিন্ন তথ্যপূর্ণ সংবাদ সচিত্র ছাপা হতো এ পত্রিকায় (রউফ, ২০১১, পৃ. ১৪-২৭)।

শেষকথা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ একদিনে হঠাৎ করে ঘটেনি– বরং এর নিজস্ব ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস আছে। ১৯৪৭-এর দেশভাগ থেকে শুরু করে ভাষার প্রশ্নে প্রথম বিরোধিতা এবং ক্রমশ বাঙালি জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ স্বাধীনতা আন্দোলনকে ত্বরান্বিত ও বেগবান করেছে। আমরা লক্ষ করি, দেশভাগের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে ঢাকায় যে চারুশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, তা ক্রমশ এই বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে গেছে এবং একে অপরকে উজ্জীবিত করছে, সহযোগিতা করছে। কিংবা ব্যাপারটাকে এভাবেও বলা যায়, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে চলেছে। এ দুইয়ের মাঝে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান।

বাংলাদেশের চারুশিল্পী সমাজ ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সবসময়ই একুশের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির পক্ষে সবসময়ই সোচ্চার ও সক্রিয় ছিল। একটি পেশাজীবী সম্প্রদায় হিসেবে চারুশিল্পীরা ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে যে ভূমিকা পালন করেছে, তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে শহিদ মিনার এবং একুশের আলপনা– চারুশিল্পীদের এ দুটি অবদান অসাধারণ ও অনন্য। ক্রমশ এ দুটি হয়ে উঠেছে বাঙালি জাতি ও সংস্কৃতির পরিচয় বহনকারী মূল্যবান স্মারক। আমরা বলতে পারি, বাঙালি জাতি যতদিন থাকবে ততদিন একুশের চেতনা অমলিন থাকবে। একই সাথে শহিদ মিনার ও একুশের আলপনাসহ বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে চারুশিল্পীদের অবদান ও ভূমিকা ইতিহাসে গুরুত্বের সাথে উল্লিখিত হবে।

তথ্যসূত্র

আকন্দ, শাওন (২০০৯)। 'ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা সংগ্রাম: বাংলাদেশের চারুশিল্পীদের ভূমিকা'। *শিল্পরূপ*। নীলিমা আফরিন (সম্পা.)। তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ঢাকা।

আজিম, মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান (২০১৩)। *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জি ১৯৭১-২০১১*। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন।

আহমদ, সাঈদ (সম্পা.) [১৯৯৭]। *হামিদুর রাহমান*। ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি।

ইসলাম, আমিনুল (২০০৩)। *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর, প্রথম পর্ব-১৯৪৭-১৯৫৬*। ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী।

ইসলাম, নজরুল (২০২২, মার্চ)। 'শরীর-ভেদী বুলেট'। *ঈক্ষণ*, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা, বর্ষ ৩৫, সংখ্যা ৩।

ইসলাম, সিরাজুল (সম্পা.) [২০০৭]। *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড। ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

ইসলাম, রফিকুল (২০০৬)। *বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন*। ঢাকা: সেড।

উমর, বদরুদ্দীন (১৯৮৪)। *ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ: কতিপয় দলিল* (১ম খণ্ড)। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

উমর, বদরুদ্দীন (১৯৮৫)। *ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ: কতিপয় দলিল* (২য় খণ্ড)। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

খাতুন, সন্‌জীদা (২০১৭)। 'ছায়ানট'। আবুল হাসনাত [সম্পা.]। *আলোকের ঝরণাতলায়*। ঢাকা।

খালিদ, সৈয়দ আবদুল্লাহ (২০০৫, ২৫শে মার্চ)। *সাপ্তাহিক ২০০০*, শাহাদাত চৌধুরী (সম্পা.), বর্ষ ৭ সংখ্যা ১৪।

গুপ্ত, কিরণশঙ্কর সেন ও করিম, সরদার ফজলুল (১৯৯৪)। *চল্লিশের দশকে ঢাকা*। ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ।

ফয়েজুল (২০০০)। *বাংলাদেশের শিল্পকলার আদিপর্ব ও ঔপনিবেশিক প্রভাব*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

বশীর, মুর্তজা (২০০১)। *মুর্তজা বশীর: মূর্ত ও বিমূর্ত*। চট্টগ্রাম: পূর্বা।

মকসুদ, সৈয়দ আবুল (২০১৭)। *কাগমারী সম্মেলন*। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন।

মামুন, মুনতাসীর ও খান, হাশেম (সম্পা.), [২০০৭]। *ঢাকা ১৯৪৮-১৯৭১ আলোকচিত্রের সংকলন*। ঢাকা: মওলা ব্রাদার্স।

মুকুল, এম আর আখতার (১৩৯১)। *পঞ্চাশ দশকে আমরা ও ভাষা আন্দোলন*। ঢাকা: সাগর পাবলিশার্স।

রউফ, শাহানারা (২০১১)। 'মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী এ. কে.এম. আব্দুর রউফ: এক বহুমাত্রিক জীবনের প্রতিচ্ছবি'। *মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী এ কে.এম. আব্দুর রউফ স্মারক গ্রন্থ*। কামরুন নাহার [সম্পা.]। ঢাকা: বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ।

রহমান, হাসান হাফিজুর (সম্পা.) [১৯৫৩]। *একুশে ফেব্রুয়ারী*। ঢাকা: পুথিপত্র প্রকাশনী।

রেজা, সি এম তারেক (২০০৪)। *একুশে ভাষা আন্দোলনের সচিত্র ইতিহাস (১৯৪৭-১৯৫৬)*। ঢাকা: নিমফিয়া পাবলিকেশনস।

সোম, বীরেন (২০১৫)। *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে শিল্পীসমাজ*। ঢাকা: চন্দ্রাবতী একাডেমি।

স্বপন, সিদ্দিকুর রহমান (২০০৮)। *বাংলাদেশের গণ-আন্দোলনে স্লোগান, প্ল্যাকার্ড ও পোস্টার*। ঢাকা: বাংলাদেশ চর্চা।

হক, সৈয়দ আজিজুল (২০১৫)। *জয়নুল আবেদিন*। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশনা।

হক, সৈয়দ আজিজুল (১৯৯৮)। *কামরুল হাসান: জীবন ও কর্ম*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

হক, সৈয়দ আজিজুল (২০০৭)। 'কামরুল হাসান', *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৮ : চারু ও কারুকলা*। লালা রুখ সেলিম [সম্পা.]। ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

হাসনাত, আবুল ও মামুন, মুনতাসীর (সম্পা.)। *ঢাকা ১৯৭১* (১৯৮৮)। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

হাসান, কামরুল (২০১০)। *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কথা*। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন।

হোসেন, আনোয়ার (১৯৯৮)। 'গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শিল্পী ও শিল্পকলার ভূমিকা ও আর্ট কলেজ আন্দোলন'। *রূপবন্ধ*, মতলুব আলী (সম্পা.)। ঢাকা: মানব প্রকাশ।

হোসেন, মাহমুদুল (২০০৭)। 'ব্যঙ্গচিত্র', *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৮: চারু ও কারুকলা*। লালা রুখ সেলিম [সম্পা.]। ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

৮০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকা। *৮০ বছরে জীবন শিল্পী ইমদাদ হোসেন*। ঢাকা ২০০৫।

পত্রিকা

কবির, শাহরিয়ার (২০১৩, ১৯শে জানুয়ারি)। *প্রথম আলো*।

পূর্বদেশ, ১৫ই মার্চ ১৯৭১।

দৈনিক আজাদ, ১৬ই আগস্ট, ১৯৫৫।

সাক্ষাৎকার

ইসলাম, আমিনুল (২০০৯, ১লা ফেব্রুয়ারি)। ঢাকা। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী : শাওন আকন্দ।

খান, হাশেম (২০০৯, ১৪ই মে)। ঢাকা। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: শাওন আকন্দ।

নবী, রফিকুন (২০০৯, ২৬শে মে)। ঢাকা। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: শাওন আকন্দ।

মনোয়ার, মোস্তফা (২০০৯, ৪ঠা মে)। ঢাকা। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: শাওন আকন্দ।

হোসেন, ইমদাদ (২০০৯, ৩রা ফেব্রুয়ারি)। ঢাকা। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: শাওন আকন্দ।